মিথ ও নিখিল বিশ্বাস

দেবকুমার সোম এবার কলম ধরছেন শিল্পী নিখিল বিশ্বাসকে নিয়ে। অকাল প্রয়াত এই শিল্পীকে ঘিরে গড়ে ওঠা মিথকেও ধরার চেষ্টায় লেখক।

কবি অনন্য রায়ের আয়ু ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। 'বিখ্যাত মেয়র, দেশী হিজড়ে / সকলেই গাল টেপে; কেউ বলে; 'ব্যাটা হবে / রবিঠাকুরের মতো সম্ভ্রান্ত কাবাব।' কবি হিসেবে সুকৃতি কুড়োবার আগেই মৃত্যু এসে ডেকে নেয় তাঁকে। অনুরূপ ঘটে কবি ফাল্গুনী রায়ের জীবনেও। মাত্র সাঁইতিরিশের জীবনে লিখেছিলেন *নষ্ট আত্মার টেলিভিশন* । 'আমি এক পরিত্রাণহীন সন্ত্রাসলিপ্ত মানুষ / আমি দেখেছি আমার ভিতর এক কুকুর কেঁদে চলে অবিরাম।' এমনই উচ্চারণ ছিল ফাল্গুনীর। বিশ শতকের ছয়-সাত দশকের এই দুই কবির স্বল্পযাপিত বেঁচে থাকা বয়সোচিত কারণেই ছিল বিক্ষুব্ধ। এদের সঙ্গে একত্রে চিত্রকর নিখিল বিশ্বাসের নাম উচ্চারিত হলে সেই অশান্ত সময়টাকে খানিক লিপিবদ্ধ করা যায়। তাঁরা সকলেই শিল্পের নামে ভূষিমাল পয়দা করতে চাননি। প্রতিবাদী হওয়ার পাটিগাণিতিক নিয়মে দরিদ্র থেকে গেছেন। কিন্তু সেই দারিদ্র তাঁদের মহানও করেনি, দেয়নি খৃষ্টের সম্মান। ফলতঃ, ভাবিকালের জন্য প্রভূত মিথের জন্ম দিয়ে তাঁরা মিশে গেছেন হেমন্তের কুয়াশায়। ঝরা পালকের সাথে।

নিখিল বিশ্বাসের বেঁচে থাকা কেবল ছত্রিশ বছর। কিন্তু যে বিক্ষুব্ধ সময়ে তিনি বেঁচে ছিলেন, সেই সময়কে নিজের মতো করে তিনি যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন। ফলে ঘাড়ধাক্কা খেয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। জীবনের অধিক সময় কেটেছে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায়। এতদসত্ত্বেও তিনি আপোষের কানাগলিতে সেঁদিয়ে যাননি। সুতপুত্র বলে জুটেছে অবজ্ঞা। দান করেছেন জন্মকবচ। কমুণ্ডল। একাঘ্নী বান লক্ষ্যভ্রষ্ট। অর্জুনবধের অন্তিম সময় অস্ত্রহীন। শিরোস্ত্রানহীন। রথের চাকা মাটিতে বসে যাওয়া 'প্রথম পার্থ' বীরের ধর্মত্যাগ করেননি। এভাবেই বাংলায় মিথের জন্ম হয়। মানুষ মৃত্যুর পরেও হেঁটে যেতে পারে।

সাতচল্লিশে দেশভাগ। ঊনপঞ্চাশে আর্ট কলেজে ভর্তি হলেন নিখিল। দ্রুত সহপাঠীদের সঙ্গে গোষ্ঠি তৈরি হল। ব্রিটিশ শাসনের শেষে দেশজুড়ে যে নতুন উদ্যোম এসেছিল সেদিন, তার অভিঘাত পরেছিল তাঁদের মধ্যেও। ফলে সব বিষয়েই চুলচেরা তর্ক। বিতর্ক। শিক্ষকদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ছেন। ছাত্ররা অসহিষ্ণু। একরুখো। নিখিল বিশ্বাস তাঁদের অঘোষিত নেতা। সেদিন নিজের কেরিয়ারের কথা না ভেবে নিখিল সত্যিই

ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তরঙ্গের ঊর্মিমালায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতে কলকাতা জুড়ে বিদ্রোহ আর বিক্ষোভ। শুরু হয়েছে খাদ্য আন্দোলন। পশ্চিমবাংলার প্রমিয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (২৫শে জানুয়ারি ১৯৫০ অবধি)। এরই মধ্যে পুলিশের গুলিতে সাতজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু। আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনী এগিয়ে এল। কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজু। ছাত্ররা বেঁকে বসলেন। তাঁদের দাবি রাজ্যপাল নন, যামিনী রায়ের মতো কোনো বিদগ্ধ চিত্রশিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হোক। ফলে সেদিনের আর্ট কলেজে বড়ো হুল্লোড় উঠল। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন প্রদর্শনী বন্ধ রাখতে। তার ফলে সে-বছরে আন্দোলনকারী বহু ছাত্রকে কলেজ হয় তাড়িয়ে দিল কিংবা পরীক্ষায় ফেল করালো। অকৃতকার্যদের মধ্যে প্রথমবর্ষের ছাত্র নিখিল বিশ্বাসও ছিলেন। তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। ফলে আর্ট কলেজে ফের ভর্তি হতে পারলেন না। এমন যখন অবস্থা, অর্থাৎ পঞ্চাশ সালে আর্ট কলেজ থেকে বিতাড়িত নিখিল কিন্তু দমে গেলেন না। তাঁর সহপাঠী আরও ছয়জন শিল্পীকে নিয়ে তৈরি করলেন একটা দল। স্বাধীন ভারতে তখন সংঘবদ্ধ শিল্প আন্দোলনের ঝোঁক। সরাসরি পশ্চিম ইউরোপের অভিঘাত। ছাত্রদের পায়ের তলায় না আছে মাটি, না আছে মাথার ওপর ছাদের নিশ্চয়তা। তবুও অনেক স্বপ্ন নিয়ে তৈরি হল *চিত্রাংশু*। নাম দিয়েছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী। তিন বছর অস্তিত্ব ছিল দলটার। কিছু প্রদর্শনীও হয়। প্রথম প্রদর্শনীতে শ্যামল দত্তরায়ের একটা ছবি পঁয়ষট্টি টাকায় বিক্রি হয়েছিল।

যৌবনের কারণে সে-দল ভেঙে গেলে নিখিল হাতে-কলমে কাজ শিখেছিলেন ইন্দোনেশিয়ার শিল্পী আফান্দির কাছে। আফান্দি কিছুকাল শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় শিল্প-শিক্ষকতা করেছিলেন। মীরা মুখোপাধ্যায়, গোপাল সান্যাল প্রমুখ ছিলেন আফান্দির ছাত্র। পুরো পাঁচ দশক জুড়ে নিখিল যে শিল্পচর্চা করেছেন, তার মধ্যে পূর্ববর্তী শিল্পের আদল পাওয়া যায়। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার কিংবা অতুল বসুর মতো পেলব, প্রাকৃতিক ছবি আঁকায় তিনি মনোযোগী থাকেন। ছয়ের দশকে এসে নিখিলের আঙ্গিক আর প্রকরণ দুই পাল্টে যায়। *সোসাইটি অফ কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস* গঠিত হলে অবধারিতভাবে নিখিল তাঁর সক্রিয় সদস্য হলেন। বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে দশজন তরুণ শিল্পীর মধ্যে তাঁর ছবিও প্রদর্শিত হয়। আর এভাবে বহু ভাঙা-গড়ায় চৌষট্টিতে *ক্যালকাটা পেন্টার্স* তৈরি হলে সেই কর্মকাণ্ডেও নিখিল জড়িয়ে পড়েন। আর এইসব বিবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে উদগীরণ ঘটল নিখিল বিশ্বাস

নামের এর বিক্ষুব্ধ আত্মার। সেই সময় তাঁর পারিবারিক জীবন চরম সংকটে। এক রকম কপর্দকশূন্য। বস্তির দরমার বেড়াঘরে খবরের কাগজের ওপর ভুষোকালি কিংবা চারকোলে বলিষ্ঠ ব্রাশের কাজে তখন তিনি জীবনের সারাৎসার আবিষ্কারে মগ্ন। অর্থনৈতিক অবস্থা এমন বিপর্যস্ত যে শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে তখনও কোথাও চাকরি জোটাতে পারেননি। পাড়ায় একটা পানের দোকান দিয়েছেন। সেখানেও যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তা যেন তিনি হাসিল করতে পারেননি।

ঊনিশশো তেষট্টিতে তাঁর একক প্রদর্শনে শিল্পতাত্ত্বিকেরা প্রথম আবিষ্কার করলেন নিখিল যেন সেই আত্মা, যে ঠিকঠাক চিনতে পেরেছেন এই বিক্ষুব্ধ সময়কে। তাঁরা প্রায় ফতেয়া দিলেন চিন-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের এই ক্রাইসিস। অথচ, বিষয়টা তেমন সরলীকরণ নয়। অন্তত নিখিলের তরফে। তাঁর ডায়রিতে তেরো এপ্রিল ঊনিশশো তেষট্টিতে আমরা A Statement নামে একটা এন্ট্রি পাচ্ছি। এখানে তিনি স্পষ্ট লিখছেন : 'The beginning of my combat series which were exhibited in 1963 exhibition, absolutely a(?) inspiration sought from different sources. Some of news-critics said that those are reaction of Chinese aggression. But unfortunately it is not. I vigorously oppose it. Chinese aggression is not my source. The basic sketches I made for this combat form 1960. There is no question for Chinese aggression. The basic question the inspiration is different. I want to unmask the inner soul of human mind.' (ডায়রির অনুলিপি দ্রষ্টব্য)।

'Inner soul of human mind' বলতে নিখিল ঠিক কী বলতে চেয়েছেন তা খুব অস্পষ্ট ইংরাজিতে লেখা এই এন্ট্রিতে। ফলে তাঁর ডায়রির অন্য একটা এন্ট্রিতে আমাদের চোখ রাখতে হয়। সতেরোই জুলাই ঊনিশশো তেষট্টির এন্ট্রিতে ব্যাপারটা এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি : 'যে দেশে শিল্পীদের দিনের আর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের অপব্যয় করতে হয় শুধু খুঁটে নেওয়া অন্নের ঋণ শোধ করবার জন্য – সে দেশের সমাজ শেষ হয়ে যায় না কেন? অর্থ সংগ্রহের গলি ঘুঁজিতে চলাফেরা (?) করার কষ্টদায়ক অসম্মানকর পন্থা ... নিতে হয় – সে দেশের সমাজ যেন বুক ফুটে দরদ কিংবা সংস্কৃতির ধ্বজাধারী বলে নিজেদের প্রকাশ করতে লজ্জা পায়। আমি তেমনই এক সমাজের লোক যে সমাজ মরে গেছে, পচে গেছে। তার শেষ হওয়াকেও আমি দেখতে চাই। অপমানের সঙ্গে, দীনতার গ্লানির সঙ্গে। নীচ, ক্ষয়ে যাওয়া মনুষ্যত্বের সঙ্গে আঁতাত পাতাতে আমি নারাজ। তাই হয়ত আমি মরব কিন্তু মরণ কামড় দিতে আমি ছাড়ব না।'

তেষট্টির ডায়রির এই দুটো এন্ট্রিকে পাশাপাশি রেখে আমরা যদি নিখিল বিশ্বাস নামের এক বিক্ষুব্ধ শিল্পীর শিল্পকর্মকে বুঝতে চাই, তাহলে মিথ সরিয়ে তিনি অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবেন। আর্ট কলেজের সেই ডামাডোলের সময় নিখিল দেখেছেন সোমনাথ হোর কিংবা বিজন চৌধুরির ভূমিকা। মূলত তাঁরাই ছিলেন আন্দোলনের মুখ। পরবর্তী সময়ে হোর এবং চৌধুরি দুজনেই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে চলে গেলেও নিখিলের কাছে সে-অবকাশ ছিল না। আর্ট কলেজে ফের ফিরতে না পাওয়া প্রথম বর্ষের এই ছাত্র প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির মঞ্চে হয়তো পৌঁছাতে চাননি। বরং বেশি করে চেয়েছিলেন স্বশিক্ষিত হয়ে উঠতে। শিল্পকে জলেডোবা মানুষের মতো আঁকড়ে ধরতে। ফলে তার প্রায় শিল্পই সহিংস। আক্রান্ত। ক্রুদ্ধ। সমসাময়িক বিজন চৌধুরী, প্রকাশ কর্মকার, গোপাল সান্যাল কিংবা সুনীল দাসের মতো নিখিলও ঘোড়ার বহু স্কেচ করে গেছেন। অন্যদের সঙ্গে তাঁর চিত্রিত ঘোড়াগুলো দেখলেই পার্থক্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। ঘোড়া এখানে একবগ্গা। অনুশাসনহীন। স্পেনীয় বুলের মতো। আবার ঘোড়ার স্কেচের পাশাপাশি যখন তিনি হিউম্যান ফিগার স্কেচ করেন, তখন আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয় নারী-পুরুষের অ্যানাটমির মধ্যে কীভাবে তিনি ঘোড়ার তেজ আর বিক্ষোভকে ধরতে চাইছেন।

তাঁর অন্যতম খ্যাত চিত্র ক্রাইস্ট। ভারতীয় সমাজে যীশুর অনুষঙ্গ তিনি এনেছেন ঈশ্বরপুত্র হিসেবে নয়। বরং একজন ঝঞ্ঝাবিদ্ধ আধুনিক মানুষ হিসেবে। সালভাদোর দালির প্রেক্ষিত থেকে যা সম্পূর্ণ বিপ্রতীক। যদিও ক্রাইস্ট চিত্ররচনায় অনেকেই তাঁর ওপর পশ্চিম ইউরোপের প্রভাবের কথা বলে থাকেন, তবে বাস্তবিক তা সরলীকরণের দিকে ঝুঁকে থাকা বলা যায়। সেই সময় নিখিল চিত্রিত এই ক্রাইস্ট ছবি বেশ আলোড়ন তুলেছিল। আজকের ব্যক্তি ধান্দাবাজির যুগে সেই আলোড়ন ঠিক অনুভব করা যাবে না। তখন পশ্চিমবাংলার আবহাওয়াটা তেমনই ছিল। প্রতিষ্ঠানের পিঠে চাবুক চালাতে তেতে উঠেছেন যুবারা। যে উন্মাদনার সূচনা হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সূচিমুখ হিসেবে, তাই তখন আরও তীক্ষ্ম। ফলে অনন্য, ফাল্গুনী কিংবা নিখিল সেদিন কোনো ব্যতিক্রমী চরিত্র নন। এর কিছু পরেই শুরু হবে নকশালবাড়ি রাজনীতি। সে আর এক অধ্যায়। তবে নকশাল রাজনীতির জমি প্রস্তুতে নিখিল বিশ্বাসের মতো শিল্পীদের ভূমিকা অগ্রাহ্য করার নয়। কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সংশ্রবে না থেকেও মানবিকতার প্রতিদিনের অপমান ঘাড় হেঁট করে মেনে নিতে পারেননি নিখিল বিশ্বাস। তাই

সামান্য কয়েক বছরের শিল্পচর্চায় তিনি নিজের যে স্বকীয়তা রেখে গেছেন। পশ্চিম বাংলার শিল্প-ইতিহাসে শুধু নয়, ভাবি সময়ের নতুন আসা চিত্রকরদের কাছেও তিনি ইন্সপিরেশন।

ফলে আজও শিল্পীকে নিয়ে আগ্রহ, কৌতুহল থাকে। তাঁর ছবি, স্কেচ দেখে আজও বহু দর্শক কিংবা ছাত্র নিজের আইডেনটিটি খুঁজতে চান। কোন অকাল প্রয়াত বিপ্লবীর মতো তাঁকে ঘিরে যে মিথ, সেই মিথের আবরণ ভেদ করে তখন তাঁকে নিকটজনই মনে হয়।